বণিক বার্তা

সম্পাদকীয়

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সহায়ক নয় বাজেট

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ| ২১:১৩:০০ মিনিট, জুন ২৭, ২০১৮

বাজেট প্রতিটি সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এটি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সবাইকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় বাজেটের গুরুত্ব অপরিসীম, যেখানে সরকার ও সরকারি খাতের একটা বিশাল অবদান থাকে। বেশির ভাগ উন্নত দেশ ব্যক্তিখাতের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় সরকার বাজেটের ওপর অতটা নির্ভরশীল নয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকার বাজেটের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এদিক থেকে বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশে সরকারের সক্ষমতা, দক্ষতা ও উন্নয়ন কৌশলগুলো বাজেটের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। পাশাপাশি ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিতকরণে সরকারের বিদ্যমান কিছু দায়িত্বেরও এর মাধ্যমে প্রতিফলন ঘটে। তাই বাংলাদেশে বাজেটের গুরুত্ব অনেক।

সরকার একটা বিরাট বাজেট দিয়েছে। বিশাল না হলেও বিরাট বাজেট বলা যেতে পারে। এতে কোনো আপত্তি নেই, বিরাট বাজেট হতেই পারে। গত কয়েক বছরের বাজেট বাস্তবায়নের দিকে যদি তাকাই, বাজেট কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে? গত বছরের বাজেট কিন্তু রিভাইজ এবং সংশোধন করা হয়েছে। এডিপি সংশোধন করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে এত বড় বাজেট এবারো যে বাস্তবায়ন হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

বরং বাস্তবায়ন না হওয়ার যথেষ্ট কারণ বা সংশয় আছে। কাজেই বাজেট দেয়াই যখন হয়েছে, গতবারের তুলনায় এবার বড় বাজেট দেয়া যেতেই পারে। এটা যেহেতু নির্বাচনের বছর, তাহলে সাধারণ মানুষ তো বুঝবে না যে কী রিভাইজ হয়েছে বা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে। অতএব সরকারের একটা বিরাট ভাবমূর্তি দাঁড়াল যে, তারা বিরাট বাজেট দিয়েছে। কোন খাতে খরচ করবে, কোন খাতে ব্যয় করবে। ফলে এ বাজেটের পেছনে একটি রাজনৈতিক ভাবনা বা দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। এতে মানুষকে খুশি বা তুষ্ট করতে করও তেমন বেশি আরোপ করা হয়নি। গতানুগতিক বাজেটের ধারাবাহিকতা থেকে এ বাজেটে চমক বা বিশেষ কোনো বিশেষত্ব নেই। কিছু বিষয় ভালো আছে, যেমন কর বেশি ধরবে না। প্রত্যাশাটা বড় করে দেখিয়েছে।

আমাদের একটা প্রত্যাশা ছিল, সাধারণ জনগণের জন্য বাজেট আসবে। তাদের জীবনযাত্রার মান আগের তুলনায় উন্নত হবে। সাধারণ মানুষের তুষ্টির জন্য বাজেটটা আসবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের জন্য এ বাজেট হয়নি। অল্প কিছু শ্রেণীকে তুষ্ট করার জন্য বাজেটটা হয়েছে। কিছু জায়গায় ছাড় দেয়া হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে কর বাড়ানো হয়নি। নানা রকম ক্যালকুলেশন করে হয়তো তারা বাজেটটা করেছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অন্যান্য কর্মসংস্থানের জন্য বাজেটে বিশেষ বার্তা থাকবে বলে ভাবা হয়েছিল। এ বিষয়ে বাজেটে প্রায় কিছুই নেই বলা যেতে পারে। এটাকে অ্যাড্রেস করে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কথা থাকবে। কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য কোনো সুবিধার কথা নেই, বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য কিছু নেই। এখানে বিশাল আয় ও ব্যয়ের একটা খাত দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি শিক্ষা খাতের দিকে তাকাই, সেই ১২ শতাংশই রয়ে গেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি। যেটা করা হয়েছে, তা শিক্ষকের বেতন-ভাতাতেই চলে যাবে। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য, শ্রেণীকক্ষের মানোন্নয়ন বা শিক্ষা উপকরণের বেহাল অবস্থার জন্য আলাদা করে কোনো বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়নি। ছাত্রদের এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি, ক্লাসরুমের উন্নয়ন ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য তো ব্যয় করতে হবে। এসব নিয়ে বাজেটে কোনো উল্লেখ নেই। কাজেই শিক্ষা খাতে সরকারের আরো গুরুত্ব দিয়ে বাজেট বৃদ্ধি করা উচিত ছিল।

স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের বিষয়টি আরো দুঃখজনক। এবার আরো কমেছে। মনে হচ্ছে, স্বাস্থ্য খাতে সাধারণ মানুষের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা চলে এসেছে। বাস্তবে তো তা নয়।

প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছু হয়তো আছে, এতে দরিদ্র মানুষরা উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু আজকাল দরিদ্র মানুষেরও তো নানা অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। যেমন— হার্টের সমস্যা, কিডনির সমস্যাসহ নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে। এসবের চিকিৎসার ব্যাপারে হাসপাতাল ও সরকারের চিকিৎসাসেবার অবস্থা তো ভালো নয়। এ বিষয়ে বাজেটে কিছু উল্লেখ নেই। এজন্য স্বাস্থ্য উপকরণ, যন্ত্রপাতি, রোগীদের পথ্য— এগুলোতে বাজেট আরো বেশি করা উচিত ছিল। এখন যেটা হয়েছে, স্বাস্থ্যটা হয়ে গেছে প্রাইভেট সেক্টরের বিষয়। সেখানে সাধ্যের বেশি খরচ করতে হয়। কারো যদি আয় হয় ১০০ টাকা, সেখানে পকেট থেকে খরচ করতে হয় ৬০ টাকা। এটা কোনো দেশে করে না। চিকিৎসার জন্য দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত লোকজন কীভাবে খরচ করবে?

অন্যান্য খাতের মধ্যে যোগাযোগ খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা কিন্তু ভালো নয়, খুবই খারাপ অবস্থা। এখানে মান বজায় রাখা এবং সময়মতো কাজ শেষ করতে না পারলে কাজ ঝুলে যায়, খরচ বেড়ে যায়। দেশের মহাসড়কের যে অবস্থা, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ বা চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার কিংবা অন্য অনেক রাস্তার অবস্থা কিন্তু ভালো নয়। এসব রাস্তা নির্মাণে গুণগত মানে একদমই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না— এক বছর যেতে না যেতেই রাস্তা বেহাল হয়ে যায়। আর আমাদের অভ্যন্তরীণ যে রাস্তাগুলো আছে, সেগুলোর অবস্থা তো যাচ্ছেতাই। অবস্থা দেখে মনে হয়, এগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের চিন্তাভাবনা আছে বলে মনে হয় না। এগুলো সাধারণ মানুষের ভেতরে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। কারণ তারা যে পণ্যসামগ্রী বাজারে নিয়ে আসবে, ভীষণ অসুবিধায় পড়ে। গত এক-দুই বছরে রাস্তাগুলোর খুব একটা উন্নতি হয়নি।

আমাদের যে মেগা প্রকল্পগুলো— বড় প্রকল্পগুলো হচ্ছে, সেগুলোরও প্রয়োজন আছে; এ প্রকল্পগুলো তারা শুরুও করবে। কিন্তু গত বছরেও সড়ক উন্নয়নের জন্য তেমন কিছু করা হয়নি, এবারো নয়। আর বড় বা মেগা প্রকল্পগুলোর প্রতি দৃষ্টি ও মনোযোগ এত বেশি যে, এতে মাঝারি বা ছোট প্রকল্পের আওতায় থাকা লোকগুলো কিন্তু সাফার করছে। মেগা প্রজেক্টগুলো ভবিষ্যতে কাজে লাগবে; কিন্তু এসব চিন্তা করলে জনকল্যাণমুখী বাজেট এটাকে বলা যায় না। সাধারণ মানুষের কথাও ভাবতে হবে। তাদের যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, সেগুলোতেও নজর দিতে হবে।

বাজেটে দেখা যাচ্ছে আয় বেশি করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে ব্যয় বেশি হলে আয়ও তো বেশি করতে হবে। এনবিআরকে সরকার একটা টার্গেট দিয়েছে, যে টার্গেটটা গতবারের সংশোধিত টার্গেটের তুলনায় ৯৩ হাজার কোটি টাকা বেশি; যা প্রায় ৩২ শতাংশ বেশি। এটা বেশ কঠিন হবে। এনবিআরের যে রেকর্ড আছে, সেটা ১৮ শতাংশ পর্যন্ত ছিল। গতবারের টার্গেট তো তারা পূর্ণ করতে পারেনি। এখন একটা কাজ করতে পারে, তাহলে হয়তো লক্ষ্যমাত্রা কাছাকাছি যেতে পারে। এনবিআর যদি তাদের ট্যাক্সের জালটা সর্বতোভাবে বৃদ্ধি করে। যারা ট্যাক্স দিচ্ছে না কিন্তু সক্ষম, যাদের টিন আছে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। ঢাকার বাইরে দৃষ্টিটা দিতে হবে। কারণ ঢাকার বাইরে প্রচুর বড় ও মাঝারি ব্যবসায়ী আছে। এ আওতাটা বাড়াতে হবে। আর ভ্যাট সংগ্রহটা যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে হয় এবং সরকারি কোষাগারে যেন ট্যাক্সটা জমা হয় ঠিকমতো, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ ট্যাক্স অনেকেই দেয় এবং তা আদায়ের পরও মাঝে কিছু লিক থাকে। ফলে সরকারের খাতে জমা হয় না। এটা বাস্তবায়ন হলে অন্তত কিছুটা ভালো কাজ হবে।

আরেকটা আয়ের খাত উল্লেখ করা হয়েছে, যেখান থেকে নেয়া হবে ১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা। এটা আসবে ব্যাংকিং সেক্টর ও সঞ্চয়পত্র থেকে। সরকার যখন ব্যাংকিং সেক্টরে চাপ দেয়, তখন বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের ওপর চাপ পড়ে। এমনিতেই এখন ব্যাংকিং সেক্টর চাপের মুখে আছে। এরপর সুদের হার আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমানত কমে যাচ্ছে। সরকার যদি ব্যাংকিং সেক্টরে ভরসা করে, তখন তারা চাপের মুখে পড়ে। সরকার যে পরিমাণ অর্থ চাইবে, তা হয়তো তখন পাবে না। এতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। তখন প্রবৃদ্ধিটা ৭ দশমিক ৮ শতাংশ টিকিয়ে রাখা মুশকিল হবে। কারণ প্রবৃদ্ধিটা ৭ দশমিক ৮ শতাংশ চাইলে সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ লাগবে ৩১-৩২ শতাংশ। এখন বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ আছে ২৪ শতাংশ। সরকারি বিনিয়োগ মিলিয়ে হয়েছে ২৯-৩০ শতাংশ। কিন্তু সরকারি বিনিয়োগে সরাসরি তো কর্মসংস্থান হয় না। সেটা হয়তো ভবিষ্যতের জন্য একটা বীজ তৈরি করে। সার্ভিস সেক্টর থেকে আর কত আসবে, এটা এখন সবচেয়ে বেশি। তবে হুট করেই বলে দেয়া যায় না যে, এটা ৭ দশমিক ৮-এ যাবে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নজর দিতে হবে। কৃষি খাত থেকে আয় কম আসে; কিন্তু কৃষি আমাদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করে। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আর কত। ফলে প্রবৃদ্ধিটা সাড়ে ছয় থেকে সাতের বেশি করা কঠিন।

এডিপিতে সাড়ে তেরশ প্রজেক্ট আছে। এখানে নন-এডিপি প্রজেক্টও আছে। সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে দক্ষতা আরো বাড়াতে হবে। প্রতি বছরই এডিপি রিভাইজ করা হচ্ছে। কাজ সময়মতো শেষ হয় না, ঝুলে যাচ্ছে। খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এতে জনগণের প্রত্যক্ষ কোনো উপকার হচ্ছে না।

সার্বিকভাবে দেখলে আমরা যে অর্জন করেছিলাম, বাজেটটা যদি সেগুলো সুসংহত করতে পারত এবং সম্ভাবনাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারত, সেটা খুব ভালো হতো। কিন্তু সেসব তো বাজেটে নেই। বাজেট বাস্তবায়ন করতে হলে সক্ষমতা দরকার। সেই সক্ষমতা এখনো আমাদের নেই। সরকারি, বেসরকারি ও রেগুলেটরিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি দরকার। এসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বেড়েছে বা কোনো উন্নতি ঘটেছে বলে মনে হয় না। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এনবিআরের নাকি সক্ষমতা বেড়েছে। সক্ষমতা বেড়েছে বলতে সেখানে লোকজন বেড়েছে; কিন্তু প্রসেস ও প্রক্রিয়া আগের মতোই আছে। লোক বাড়ালেই সক্ষমতা বাড়বে নাকি? এবারের বাজেটটা তাই আলাদাভাবে চমকের কোনো বাজেট নয়। আমরা ভেবেছিলাম, উন্নয়নের বাজেট হবে এবং উন্নয়নটা হবে টেকসই। সেটা দেখছি না। কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন করলেও সরকারের কতগুলো ভুল পলিসির কারণে তা হঠাৎ করে আবার নেমে যায়। ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে বাজেটে সেভাবে পরিষ্কার কোনো কথা নেই। আর সুশাসন ও জবাবদিহির বিষয়ে কোনো চিন্তাও দেখা যায়নি। নানা রকম ভুল হচ্ছে, প্রজেক্ট ঝুলে গিয়ে সময় বেড়ে যাচ্ছে, মগবাজারের ফ্লাইওভারে ডিজাইন ভুল হয়ে একটা উল্টাপাল্টা কাণ্ড ঘটল, যারা ভুল করেছে, তাদের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কাজের ব্যাপারে সরকারের যদি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যাপার না থাকে, তাহলে কাঙ্ক্ষিত ফল আশা করা যায় না। এভাবে দ্রুত বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় চার দশক ধরে বিভিন্ন কার্যক্রম নেয়া হয়েছে উন্নয়নের নামে। ষাটের দিকে প্রথম উন্নয়ন দশকের মূল লক্ষ্য ছিল প্রবৃদ্ধি (growth); দ্বিতীয় দশকে লক্ষ্য ছিল প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সমতা (growth with equality); তার পরের দশকে এল বিকেন্দ্রীকরণ (decentralization); গণচেতনা (mass awareness) এগুলো; তারপর এখন উদ্দিষ্ট লক্ষ্য হলো— অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন

(participatory development), পরিবেশের সঙ্গে ভারসাম্যমূলক উন্নয়ন উৎসাহে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মদদপুষ্ট বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে। বাংলাদেশও এ রকম কৌশলের বাইরে থাকেনি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ রকম বিভিন্ন উন্নয়ন (sustainable development), নারী উন্নয়ন এগুলো। এসব কৌশলই এসেছে দাতা দেশগুলো থেকে। তাদের প্রচেষ্টার ফলেও গণদারিদ্র্য দূর হয়নি, বরং অনেক দেশে বেড়েই চলছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য দারিদ্র্য একটি বিশাল সমস্যা। বস্তুত আপেক্ষিক দারিদ্র্য ক্রমেই চরম আকার ধারণ করছে এবং এটা সামাজিক একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক স্থিতিশীলতাও সঙ্গিন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোনো কোনো 'টার্গেট গ্রুপ'ভিত্তিক প্রকল্প দারিদ্র্য কিছুটা লাঘব করলেও সার্বিকভাবে দারিদ্র্য তেমন কমেনি। বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ পল্লী অঞ্চলে। অতএব দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং পল্লী উন্নয়ন এ দুটির যোগসূত্র রয়েছে। তবে এটা লক্ষ করা যায়, 'উন্নয়ন' শব্দটির অস্পষ্ট ব্যবহারের ফলে অনেক সময় মূল সমস্যা দারিদ্র্য আড়ালে থেকে যায়।

উন্নয়নকে সুশাসন ও গণতন্ত্র থেকে আলাদা করে দেখা ঠিক নয়। উন্নয়ন ও গণতন্ত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উদাহরণ দেয়া হয়, গণতন্ত্র ছাড়াও বিশ্বের কিছু দেশে উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু সে উন্নয়ন টেকসই ও সমতাভিত্তিক নয়। সেখানে শুধু বস্তুনির্ভর প্রবৃদ্ধি ও ভোগবাদের প্রসার হয়েছে। মূল্যবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা এগুলোর প্রাধান্য দেয়া হয়নি। বাংলাদেশ ওই পথে চলুক, আমরা সেটি চাই না।